দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR 16 1999
পৃষ্ঠা কলাম

এডওয়ার্ড কলেজ ।। শতাব্দীর মহীরুহ

আবদুল মতিন

একশ' বছর কত সময়? কসমিক ক্যালেন্ডারে একটা বিন্দুবৎ। কিন্তু একটা মানুষের জীবনে এক শ' বছর একটা বিরাট, বিস্তৃত, বর্ণিল নক্সীকাঁথার মতো। আর সেই মানুষটি হন যদি প্রচণ্ডভাবে সৃজনশীল। এক শ' পাঁচ বছর বয়সে 'সওগাত' সম্পাদক জনাব নাসিরুদ্দিন যখন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তখন সারা দেশের সুধীবৃন্দ চমকে উঠে দেখতে পেলেন, হঠাৎ যেন আচমকা ঝড়ে একটা বিশাল বটবৃক্ষ ভেঙ্গে পড়ল। শিল্প, সাহিত্য, সম্পাদনা ও লেখক তৈরির এক বিশাল কারিগর চলে গেলেন তাঁর অনন্তধামে। আর যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক শ' বছর পাড়ি দেয় তাহলে সেটা তো নিতান্তই বিরাট গর্বের বিষয়। ঠিক তেমনি একটা ঘটনা সম্প্রতি ঘটে গেল উত্তরবঙ্গের ছোট্ট শহর পাবনাতে। সাড়ম্বরে পালিত হলো পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানমালা। মার্চ মাসের ৬ থেকে ১০ পর্যন্ত এই পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যাপীঠের সাবেক অধ্যক্ষ আবদুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডাক, তার, গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়ীদ, কলেজের অধ্যক্ষ শেখ কুতুবুদ্দিন, অধ্যাপক আনসার আলি, ছাত্র সংসদের ভিপি সন্তোষ কুমার হালদার, মনোয়ার হোসেন জাহেদী ও লায়লা নাসিম। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর হর্ষধ্বনিতে সেদিন মুখরিত হয়ে উঠেছিল এই জ্ঞানচর্চার শতায়ু মহীরুহটি। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর মতো আমিও একদিন এই কলেজে পা রেখেছিলাম। পড়াশোনা করেছিলাম, ছাত্ররাজনীতি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও কলেজ ইউনিয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলাম। এটা ছিল যেন গভীর নাড়ির টান। আমার কলেজের সময়কালটা ছিল ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের শুরুর দিকটা পর্যন্ত। না, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে আমি এই মহামিলন যজ্ঞে যোগ দিতে পারিনি। কিন্তু পুরো পাঁচটা দিনই আমার মন পড়েছিল ঐ কলেজের প্রাঙ্গণ জুড়ে। আহা, কলেজে গিয়ে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এমনকি পিয়ন-দারোয়ানের যে ভালবাসা পেয়েছিলাম সে ঋণ জীবনে কোন দিন শোধ করতে পারব না।

কেমন ছিল একজন টগবগে যুবকের কাছে সেই সময় কালটুকু! আমাদের সময়ে ক্যাম্পাসে সেশনজট শব্দটি অজ্ঞাত ছিল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাইবোনের মতো সুমধুর সম্পর্ক ছিল। হ্যাঁ, তখনও ছাত্র রাজনীতি ছিল কলেজে বেশ জোরেশোরে। ছিল ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সেই ১৯৫৬ সালে ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জেনারেল সেক্রেটারি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। প্রতিপক্ষে ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা আজাহার আলি মনোনীত ছাত্রনেতা সৈয়দ রেজা কাদের। তুমুল প্রতিযোগিতা। তখন কলেজ নির্বাচনে সবেমাত্র মাইক্রোফোন চালু হয়েছে। এক পর্যায়ে যখন ছাত্রলীগের মাইকে ঘোষিত হলো- 'এই যে আসছেন কায়েদে আযম জিন্নাহর মতো পা ফেলে ফেলে আমাদের নেতা সৈয়দ রেজা কাদের'। তখন আমার বোঝা হয়ে গেছে জিতে যাব নির্বাচনে। সারা দিনের পরিশ্রমের পর প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ঘোষণা করলেন কলেজ জেনারেল সেক্রেটারি ও ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে বিজয়ীদের নাম। মতিয়ুর রহমান ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমি জেনারেল সেক্রেটারি। মতিয়ুর ছাত্রলীগের, আমি ছাত্র ইউনিয়নের। তার মানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। যদি কেউ আজ প্রশ্ন করে যে সেদিন কি রকম মারামারি, ভাংচুর ও কাটাকাটি হয়েছিল? তাহলে সে নিরাশ হবে। বিজয় মিছিল বের করার আগে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দের দোয়া নিয়ে ছাত্রলীগ নেতা আজাহার ও পরাজিত সৈনিক রেজা কাদেরের সাথে কোলাকুলি করে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে আমরা শহর পরিক্রমা করেছিলাম। আজকের ক্যাম্পাসগুলোয় যেমন লাশের ছড়াছড়ি, সেদিন আমাদের সময়ে ছিল ভালবাসার ছড়াছড়ি, মিলনের রাখীবন্ধন। তাই আমার স্মৃতিতে আমাদের কলেজটি আজও সোনায় মোড়া এক আলাদা জগত। সেদিন ছাত্রনেতা হওয়া সত্ত্বেও বিজয় মিছিল শেষে বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন, রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন ও হোসিয়ারি শ্রমিক ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মীদের কাছ থেকে যে প্রাণঢালা অভিনন্দন পেয়েছিলাম তা আমার আজীবন মনে থাকবে। রেজা কাদেরের সাথে আমার বন্ধুত্ব এখনও অটুট আছে। আর আমার বন্ধু ছাত্রলীগ নেতা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অতি স্নেহের পাত্র আজ লন্ডনে ব্যারিস্টার আলি আজহার নামে বহুল পরিচিত। দুঃখের বিষয় আমার বন্ধু আজহার এখন বঙ্গবন্ধুর খুনীদের সমর্থনে লন্ডনে গঠিত 'লিগ্যাল এইড' কমিটির নাকি একজন প্রধান প্রবক্তা! আমি ১৯৮৩ সালে লন্ডনে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারলাম আজাহার 'বাংলাদেশ পাকিস্তানভুক্তি সমিতির' প্রধান উদ্যোক্তা। খুব দুঃখ পেলাম। তাই আর দেখা করলাম না। কোন কথাও বলিনি। একজন প্রবল মুজিব ভক্ত কি করে এমন প্রচণ্ডভাবে মুজিব-বিরোধী ও আওয়ামী লীগ বিরোধীতে পরিণত হলেন এটা আমার কাছে আজও একটা বড় বিস্ময়!

এবার আসি মতিয়ুর রহমানের কথায়। ঢাকায় যখন আগরতলা মামলা পুরোদমে চলছে তখন 'বাংলাদেশ অবজার্ভারের পক্ষ থেকে যাঁরা সে মামলা কভার করতে যেতেন তাঁরা আমাকে প্রায়ই বলতেন ঐ মামলার একজন আসামী PAF-এর অফিসার আপনাকে অবশ্যই দেখা করতে বলেছেন। আমি বলতাম, পাকিস্তান বিমান বাহিনীর এমন কাউকে তো আমি চিনি না। যাক, সে কথা। দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমি আমার জোনাকি সিনেমা হলের পিছনে তেতালা ছোট্ট বাড়িটাতে বসে একটা ম্যাগাজিন পড়ছি এমন সময় দরজায় টোকা। বললাম, ভিতরে আসুন। মুহূর্তেই আমি স্তম্ভিত, হতভম্ব। 'আরে লিডার, কতবার যে খবর পাঠালাম অথচ কোর্টে গেলেন না!' আমি তাঁকে সানন্দে জড়িয়ে ধরলাম। আমি চিরকালই মানুষের ভালবাসাকেই সবচেয়ে বড় করে দেখি। তাই বোধ হয় দুঃখও পাই অনেক বেশি। চা-নাস্তা খেতে খেতে মতিয়ুর বলল, 'লিডার, আমি তো আর বেশি দিন বাঁচব না। লাংগস ক্যান্সারে মারা যাব অল্পদিনেই।' আমি সুস্থ মানুষটার কথা শুনে হো হো করে হাসছিলাম। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু কিছুকাল পরে কাগজে তাঁর ক্যান্সারে মৃত্যুর খবর পড়েছিলাম। খবরটা পড়ে সেদিন আমি একা একা অঝোরে কেঁদেছিলাম। আমার বাড়ির কেউ তা জানে না। হায়রে এই ছিল সেদিন প্রাক্তন ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের সম্পর্ক! আজ কি তা কেউ বিশ্বাস করবে? আমার বন্ধু ছিলেন নাটক-পাগল খালেদ রশীদ। প্রিন্সিপ্যাল আজিমুদ্দীন আহমেদের তিনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন নাটকের জন্য। কলেজ ছাত্রলীগের ভিপি হয়েছিলেন তিনি। কেউ কেউ তাঁকে তৈমুর লং বলে ডাকত কলেজে। কলেজের টাউন হোস্টেলে থাকতেন খালেদ রশীদ। পান খেয়ে মুখ লাল করে এমন মধুর হাসিতে খালেদ কথা বলতেন তা ভুলবার নয়। কয়েক বছর আগে শুনেছি মার্কসবাদে প্রচণ্ড বিশ্বাসী হয়ে খালেদ রশীদ হানাদার পাকবাহিনীর সাথে বীরের মতো লড়াই করে খুলনা অঞ্চলে শহীদ হন। খালেদ রশীদের কথা মনে হতেই আমি অবাক হয়ে ভাবি সত্যিই 'জনযুদ্ধ' বোধহয় মানুষকে এমনিভাবেই বদলে দেয়! আরও জনা কয়েক বন্ধুর নাম মনে থাকবে। তওফিক আজিজ খান, আবদুস সামাদ, আবদুর রহীম ও আবদুল মাজেদ। পাশাপাশি তিনজন মহিলার কথা বলা দরকার। তাঁরা হলেন- নীলুফার আহমেদ, সৈয়দা দীপ্তি রানী ও মোহিব্বুল আরা মায়া। তওফিক আজিজ, ক্রিকেট কমেন্টটেটার হিসাবে খ্যাত (বাংলা ভাষায় অগ্রদূত) বর্তমানে বিশিষ্ট সাংবাদিক। সামাদ মানে জেনারেল আবদুস সামাদ, চীফ অব জেনারেল স্টাফ হিসাবে চাকরি করে এখন ঢাকাতেই অবসরযাপন করছেন। চিরকুমার আবদুর রহীম। এক সময়ে কলেজের স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। এখন লন্ডন নিবাসী। গত ৬ মার্চ তারিখে ৭ মাস ঢাকায় থেকে উড়ে গেলেন লন্ডনে। ডঃ আবদুল মাজেদ এফআরসিএস। প্রাক্তন বিএমএ প্রেসিডেন্ট ও প্রথম কেয়ারটেকার সরকারের একজন এডভাইজার। বর্তমানে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের ইএনটি'র অধ্যাপক। মহিলাদের মধ্যে নীলুফার আহমেদ মন দেয়া-নেয়া করে সেই সুদূর আমল থেকেই ডাঃ মাজেদের গৃহবধূ। তিনিও একজন এফআরসিএস ডাক্তার। দীপ্তি ঐ একই কায়দায় সাংবাদিক কামাল লোহানীর স্ত্রী। মায়া, চট্টগ্রাম বন্দরের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আমানুল হক চৌধুরীর অর্ধাঙ্গিনী। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ইংরেজীর অধ্যাপক ও সুসাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ছোট ভাই। মায়া ছিল তখন কলেজের ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় মহিলা নেত্রী। আমার সাথে আজও তাঁর পারিবারিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ন আছে। কলেজ সংসদীয় নির্বাচনে আজকের আর একজন খ্যাতনামা মহিলা ও তাঁর ভাই মরহুম মনসুর আমাকে আন্তরিক সমর্থন দিয়েছিলেন। তিনি খ্যাতনামা শিল্পী আসমা কিবরিয়া। তিনি এসএএমএস কিবরিয়া বর্তমান অর্থমন্ত্রীর স্ত্রী। তিনি তখন কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়তেন। তাঁর পিতা মরহুম আলি আহমেদ সাহেব ছিলেন তখন পাবনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ছিলেন অতি সরলমনা ডিএম। কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপ্যালদের সামনে ছাত্রনেতাদের ধমকিয়ে আসতেন। বলতেন, 'ওদের যেন আমাকে জেলে দিতে না হয়।' আজ তাঁদের মতো ডিএম তথা ডিসি বোধহয় বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি (Endangered species)। কথাগুলোয় বার বার নিজের কথা এসে গেলেও আমি মার্জনা চেয়েই বলব, কেমন সুন্দর স্বর্গীয় আনন্দে ভরা ছিল আমাদের কলেজ জীবন!

এই কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্কসভা, খেলাধুলা, নাটক প্রভৃতি নিয়মিত হতো। এ ব্যাপারে প্রিন্সিপ্যাল আজিমউদ্দিন আহমেদ সাহেবের যথেষ্ট অবদান ছিল। আর কলেজের বাইরে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'শিখা সংঘের' মাধ্যমে আমরা রবীন্দ্র-নজরুলজয়ন্তি ও সুকান্তজয়ন্তি নিয়মিত করেছি। এখানে একঝাঁক শিল্পী গান গাইতেন। পরবর্তীতে তাঁরা কলেজেও গান গেয়েছেন। উভয় জায়গার অনুষ্ঠানে যাঁরা নিয়মিত শিল্পী ছিলেন তাঁদের মধ্যে শম্ভু জোয়ার্দার, রূপবাণী শিকদার, রেণু অধিকারী, ইলা মজুমদার, অনিমা রায়, অনিতা তলাপাত্র, মনীষা চক্রবর্তী, নিতু জোয়ার্দার, গোপাল জোয়ার্দার, মোজাম্মেল হক ও দেবদাস শিকদার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

আজ ৪৭ বছর পরে, অর্ধশতাব্দী পরে এই স্মৃতিচারণের সর্বজনীন কোন অবদান আছে কি? অবশ্যই আছে। আজ শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানি। আমাদের সময়ে ছিল গান, কবিতা আবৃত্তি ও বিতর্কসভার ছড়াছড়ি। আজ চার দিকে মাসলম্যানদের জয়যাত্রা। আমাদের সময়ে কলেজ জিমনেসিয়ামে যাঁরা ব্যায়াম করতেন তাঁরা পরবর্তীতে দু'একজন বিশিষ্ট ব্যায়ামবীরের খেতাব পেয়েছেন কলকাতা গিয়ে। আমাদের শিক্ষক নলিনী রঞ্জন রায়, মাখন লাল লাহিড়ী, বসন্ত অধিকারী, আমিনুল হক, খলিলুর রহমান, নির্মল কুমার চক্রবর্তী, অনিল মজুমদার প্রভৃতির তুলনা হয় না। অবশ্য এই কলেজের অধ্যক্ষ কিংবদন্তির নায়ক আর বোসে অর্থাৎ রাধিকানাথ বোসকে দেখিনি। তিনি ইংরেজী পড়াতেন। তাঁর প্রচণ্ড সুখ্যাতি আজও পাবনার অশীতিপর, বৃদ্ধদের মুখে মুখে ফিরে। পরবর্তীতে রায় বাহাদুর রাধিকানাথ বোস হিসাবে তিনি পরিচিত হন। আর বোস যখন অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন সে দিনটি ছিল ১৯১৪ সালের ২১শে জুলাই। ঐ সময়টি প্রথম মহাযুদ্ধের কাল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সেই সময় লর্ড হার্ডিঞ্জ মাত্র ১৪ হাজার সৈন্য দেশে রেখে অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যকে ফ্রান্স-ফ্ল্যার্ডার্সে জার্মান সৈন্যের প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। এ খবর জেনে অগ্নিযুগের মহানায়ক রাসবিহারী বসু দেশীয় সৈন্যদেরকে বিপ্লবী করে তোলার জন্যে সুদক্ষ বিপ্লবী নায়কদেরকে বেনারস, লাহোর, পেশোয়ার, দিল্লী ইত্যাদি স্থানে পাঠান। রাসবিহারী বসু চলে গেলেন লাহোর ও অমৃতসরে। আর বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব নিলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ (বাঘা যতীন)। এই বছরেই সপ্তম উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পাবনা গোপালচন্দ্র ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে। তখন অধ্যক্ষ আর বোসের কলেজ সেখানেই ছিল। তখন এডওয়ার্ড কলেজের নিজস্ব কোন জমি ছিল না। নোবেল প্রাইজ বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ সেখানে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন।

ঐখানে সেদিন রবীন্দ্রনাথ বলেন- "আজ আমি এখানে যাহা পাইলাম, তাহাই আমার সর্বাপেক্ষা বড় জিনিষ। ইউরোপে সম্মান পাইয়াছি, কিন্তু আজ সাহিত্যের মন্দিরে যে নির্মাল্য পাইলাম, তদপেক্ষা বড় বোধ হয় সে সম্মান নহে। ..... শস্য শ্যামল, পদ্মাতীরে আমার যে সৌভাগ্যের উদয় হইল, তাহা চিরদিন মনে থাকিবে।"

[দ্রষ্টব্য ঃ শতাব্দীর ছায়াপথে এডওয়ার্ড কলেজ। অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন জাহেদী]

এখানে আর একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাবনা কলেজেও তখন ভারতীয় রাজনীতির ঝড়ের দোলা লেগেছে। সেই ১৯৩৩ সালে শিলিগুড়ির প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা বীরেশ্বর মজুমদারের ছেলে চারু মজুমদার শিলিগুড়ি থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হন। বিএ পরীক্ষার আগে ১৯৩[illegible] সালে তিনি রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরবর্তী ১৯৬৩ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী (CPI-ML) গঠন করে সারা ভারতে সর্বাধিক উচ্চারিত বিপ্লবী নকশালবাড়ির নেতা হিসাবে পরিচিত হন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আর বোস (১৯১৪-৪৭) পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৩ বছর এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গোপাল চন্দ্র লাহড়ীকে। শ্রদ্ধা জানাই সেই সমস্ত মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ও জমিদারকে এবং অন্যান্য গুণীজনকে যাঁরা এই মহতী প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে জমিজমা, অর্থকড়ি ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আসলেই একটা কলেজ এক শ' বছরে তো লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জন্ম দিয়েছে। তাঁরা আজ অনেকেই সুনাম নিয়ে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। এই কলেজের মেধাবী ছাত্র সারা এশিয়া মহাদেশের প্রথম বাঙালী স্নায়ুশল্য চিকিৎসক ডঃ অশোক বাগচীর একটি কবিতার কয়েক পঙক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এই কথামালার ইতি টানছি-

"আজ উনবিংশ শতকের সপ্তনবতিতম শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে/ আজিকার পল্লবিত কুসুমিত দিনে/এখানে মিলেছি মোরা-/পুণ্য সেই পবিত্র কালের জন্য/এস, বন্ধু, এস ভাই সুধীজন মিলে/সেই অক্ষয় এডওয়ার্ড মহীরুহে/করজোড়ে করি আরাধনা!!"